দ্বিতীয় অধ্যায়

শূন্যতা থেকে শুধু শূন্যতাই মেলে

[পাশ্চাত্যে শূন্যের প্রত্যাখ্যান]

শূন্যতা থেকে কোনো কিছুর সৃষ্টি সম্ভব নয়।

লুক্রেশিয়াস, *দে রেরুম নাতুরা*

পাশ্চাত্য দর্শনের একটি মৌলিক ধারণার সাথে শূন্যের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। সেই ধারণাটির মূলে ছিল পিথাগোরাসের সংখ্যার দর্শন। জেনোর১ প্যারাডক্সগুলোর মাধ্যমে ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুরো গ্রিক সমাজের মূল ধারণাই ছিল: শূন্যতা (void) বলতে কিছু নেই।

গ্রিক সভ্যতার পতনের অনেক দিন পরেও পিথাগোরাস, এরিস্টটল ও টলেমিদের গড়া গ্রিক সমাজ টিকে ছিল। সেই সমাজে শূন্যতা বলতে কিছু ছিল না। ছিল না শূন্য। এ কারণে পাশ্চাত্য প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত শূন্যকে মেনে নিতে পারেনি। এর ফল ছিল অনেক খারাপ। শূন্যের অভাবে গণিতের অগ্রগতি থমকে থাকে। বিজ্ঞানে নতুন নতুন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ থাকে। এছাড়াও ঘটনাক্রমে পঞ্জিকায় গণ্ডগোল লাগায়। শূন্যকে গ্রহণ করতে হলে পাশ্চাত্যের দার্শিনিকদেরকে তাদের সমাজকে নির্মূল করতে হত।

গ্রিক সংখ্যা-দর্শনের উৎপত্তি

আদিতে ছিল অনুপাত, অনুপাত ছিল ঈশ্বরের সাথে, আর অনুপাতই ছিল ঈশ্বর। ২

- জন ১:১

জ্যামিতি আবিষ্কার করা মিশরীরয়া গণিত নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করেনি। তাদের কাছে এটা ছিল দিন গণনা ও ভূমির বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণের একটি হাতিয়ার। তবে গ্রিকদের চিন্তাধারা ছিল খুব আলাদা। তারা মনে করত, সংখ্যা ও দর্শনকে আলাদা করা সম্ভব নয়। দুটোকেই তারা খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল। আসলে সংখ্যা নিয়ে গ্রিকরা বাস্তবিক অর্থেই খুবই উৎসাহী ছিল।

মেটাপনটামের হিপাসাস জাজাজের ডেকে উঠে দাঁড়ালেন। নিলেন মরার প্রস্তুতি। চারপাশ ঘিরে রয়েছে একটি গোপন ভাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা। যাদের বিশ্বাস নষ্ট করেছেন তিনি। হিপাসাস এমন একটি গোপন জিনিস প্রকাশ করেছেন যা গ্রিকদের চিন্তার কৌশলের জন্যে প্রাণঘাতী ছিল। ঐ ভাতৃসঙ্ঘ যে দর্শন দাঁড় করাতে চেয়েছিল তাকে ধ্বংস করার মতো একটি গোপনীয় জিনিস ছিল সেটি। সেই গোপন জিনিস প্রকাশের দায়ে মহান পিথাগোরাস নিজে হিপাসাসকে পানিতে ডুবিয়ে মৃত্যদণ্ড দেন। সংখ্যা-দর্শনকে বাঁচাতে ঐ সঙ্ঘ খুনও করত। কিন্তু হিপাসাস যে গোপন জিনিস ফাঁস করেছিলেন, সেটা শূন্যের তুলনায় তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়।

সঙ্ঘের নেতা ছিলেন প্রাচীনকালের প্রগতিবাদী পিথাগোরাস। বেশিরভাগ বর্ণনা অনুসারে তুরস্কের নিকটবর্তী গ্রিক দ্বীপ সামোসে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সালে তাঁর জন্ম। দ্বীপটা হেরা দেবীর মন্দির ও খুব উন্নত মদের জন্যে বিখ্যাত। প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যে যথেষ্ট কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। কিন্তু পিথাগোরাসের ধ্যানধারণাগুলো হার মানায় সে কুসংস্কারকেও। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি ট্রোজান বীর ইউফরবাসের নবজন্মপ্রাপ্ত রূপ। এ কারণে পিথাগোরাস জোরালোভাবে মনে করতেন, মৃত্যুর পরে প্রাণীদেরসহ সকল আত্মা নতুন দেহে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণে তিনি ছিলেন কঠোর নিরামিষভোজী। তবে সিম খেতেন না, কারণ এতে পেট ফুলে যায়। দেখতেও লাগে লজ্জাস্থানের মতো।

হয়ত পিথাগোরাস প্রাচীনকালের একজন প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ হয়ে থাকবেন। তবে তিনি ছিলেন জাঁদরলে বক্তা। প্রখ্যাত পণ্ডিত। আর একজন জাদুকরী শিক্ষক। কথিত আছে, তিনি ইতালিতে বসবাসরত গ্রিকদের জন্যে সংবিধান রচনা করেছিলেন।ছাত্ররা দলে দলে জড় হত তাঁর কাছে। অল্প দিনের মাথায়ই তিনি একদল উচ্চপদস্থ শিষ্য পেলেন, যারা মনিবের কাছ থেকে শিখতে উৎসুক ছিল।

পিথাগোরীয়রা নেতার অনুশাসন মেনে চলত। তাদের বিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম ছিল, মহিলাদের সাথে একান্তে সময় কাটানো উচিত শীতকালে। গ্রীষ্মকালে এটা করা যাবে না। তাদের মতে, খাবার ঠিক মতো হজম না হওয়াই সব রোগের মূল কারণ, খাওয়া উচিত শুধু কাঁচা খাবার, পানি ছাড়া অন্য কিছু পান করা ঠিক নয় এবং মোটেই পশমি কাপড় পরা যাবে না।

গ্রিকরা তাদের সংখ্যাগুলো পায় মিশরীয় জ্যামিতিবিদদের কাছ থেকে। এ কারণে গ্রিক গণিতে আকৃতি ও সংখ্যার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। গ্রিক গণিত ও দার্শকনিকদের কাছে এ দুটো জিনিস ছিল একই। (তাদের প্রভাবের কারণে এমনকি আজও আমরা *বর্গ* সংখ্যা ও *ত্রিভুজ* সংখ্যা দেখতে পাই) [চিত্র ৫] সে সময় গাণিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করা ছিল সুন্দর একটি ছবি আঁকার মতোই সোজা। প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদরা পেন্সিল ও কাগজের বদলে ব্যবহার করত কম্পাস ও রুলার। আর গ্রিকদের কাছে আকৃতি ও সংখ্যার সম্পর্ক ছিল খুব গভীর ও গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ।প্রতিটি সংখ্যা-আকৃতির ছিল একটি করে গোপন অর্থ। আর সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা-আকৃতিগুলোকে পবিত্র মনে করা হত।

স্বাভাবিকভাবেই পিথাগোরীয়দের আধ্যাত্মিক প্রতীকও ছিল একটি সংখ্যা-আকৃতি: পেন্টাগ্রাম বা পাঁচকোণা তারা। এই ছোট ছবিটিই অসীমের একটি ছোট্ট নমুনা। তারার রেখাগুলোকে জড়িয়ে আছে পঞ্চভুজটি। পঞ্চভুজের কোণাগুলোকে রেখার সাথে যোগ করলে একটি ছোট ও উল্টা পাঁচকোণা তারা পাওয়া যায়। যা অনুপাতের দিক থেকে ঠিক আগের তারাটির মতোই। এতেও আবার আরও ছোট একটি পঞ্চভুজ আছে। যাতে আছে আরও ছোট একটি তারা ও ছোট একটি পঞ্চভুজ। এভাবে চলতেই থাকে (৬ নং চিত্র দেখুন)। তবে মজার ব্যাপার হলো, পিথাগোরীয়দের কাছে পেন্টাগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই স্ব-পুনরাবৃত্তি ছিল না। সেটা লুকানো ছিল তারার রেখার মধ্যে। এগুলোর মধ্যে ছিল একটি সংখ্যা-আকৃতি, পিথাগোরীয়দের কাছে যা ছিল মহাবিশ্বের চূড়ান্ত প্রতীক। সেটা হলো গোল্ডেন রেশিও বা সোনালী অনুপাত।

চিত্র ৫

বর্গ ও ত্রিভুজ সংখ্যা

চিত্র ৬

পেন্টাগ্রাম

সোনালী অনুপাত গুরুত্ব পেয়েছেও একটি পিথাগোরীয় আবিষ্কার থেকে। যদিও এখন সেটা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। আধুনিক স্কুলগুলোতে শিশুরা পিথাগোরাসের নাম শোনে তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যটির জন্যেই: সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান। তবে এটা আসলে আরও প্রাচীন আবিষ্কার। পিথাগোরাসের জন্মের ১,০০০ বছরেরও বেশি সময় আগে এটা মানুষ জানত। প্রাচীন গ্রিসে মানুষ পিথাগোরাসকে চিনত অন্য একটি আবিষ্কারের জন্যে। সেটা হলো সঙ্গীত গ্রাম।

লোককাহিনী অনুসারে একদিন পিথাগোরাস একটি একতারা নিয়ে খেলছিলেন। যা একটি বক্স ও একটি তার দিয়ে তৈরি (চিত্র ৭)। একটি সোয়াড়িকে একতারার উপরে-নীচে নামিয়ে পিথাগোরাস তাঁর যন্ত্রের সুর পরিবর্তন করতেন। একটু পরেই তিনি বুঝতে পারলেন, তারের একটি অদ্ভুত হলেও অনুমেয় আচরণ লক্ষ্যণীয়। সোয়াড়ি ছাড়া তারকে টান দিলে একটি পরিষ্কার সুর পাওয়া যায়। এর নাম মৌলিক সুর। সোয়াড়িকে একতারায় রেখে তারের সাথে স্পর্শ করালে বাজতে থাকে সুর পাল্টে যায়। সোয়াড়িকে একতারার ও তারের ঠিক মাঝখানে রাখলে তারের দুই অংশেই একই সুর বাজে। এই সুর হয় তারের মৌলিক সুরের চেয়ে পুরোপুরি এক অষ্টক বেশি। সোয়াড়িকে একটু সরালে হয়ত এক অংশে তারের তিন পঞ্চমাংশ ও অপর অংশে দুই পঞ্চমাংশ থাকল। পিথাগোরাস দেখলেন, তারের অংশগুলোকে ধরে টান দিলে দুটি নিখুঁত পঞ্চক সুর তৈরি হয়। একেই সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্মৃতি-জাগানিয়া সঙ্গীত মিশ্রণ বলা হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে পাওয়া যায় ভিন্ন সুর। সেটা আনন্দদায়কও হতে পারে, বিরক্তিকরও হতে পারে। (যেমন, বেসুরো ত্রিসুরকে (tritone) বলা হয় সঙ্গীতের প্রেত। মধ্যযুগের সঙ্গীত বিশারদরা এই সুর গ্রহণ করেননি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পিথাগোরাস যখন সোয়াড়িকে তারের এমন জায়গায় রাখলেন যেখানে তার সরল অনুপাতে বিভক্ত হয় না, তখন সৃষ্ট সুর ভাল হয় না। উৎপন্ন শব্দ হত বেসুরো। মাঝেমাঝে হত অনেক খারাপ। মাঝেমধ্যে তো সুর পাগলের মতো উঠা-নামা করত।

পিথাগোরাসের কাছে সঙ্গীত ছিল একটি গাণিতিক চর্চা। বর্গ ও ত্রিভুজের মতোই রেখারাও ছিল সংখ্যা-আকৃতি। অতএব, একটি তারকে দুই ভাগ করা আর দুই সংখ্যার একটি অনুপাত নিয়ে কাজ করা একই কথা। একতারার ঐকতান আসলে গণিতেরই ঐকতান। এবং প্রকারান্তরে মহাবিশ্বেরেই ঐকতান। পিথাগোরাস রায় দিলেন, শুধু সঙ্গীতকেই নয়, অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে সকল সৌন্দর্যকে। পিথাগোরীয়রা মনে করতেন, অনুপাত সঙ্গীত ও ভৌত সৌন্দর্যের এবং গাণিতিক সৌন্দর্যের নিয়ন্তা। প্রকৃতিকে বোঝা ছিল অনুপাতের গাণিতিক বিধি বোঝার মতোই সরল কাজ।

চিত্র ৭

মরমি একতারা

সঙ্গীত, গণিত ও প্রকৃতির পরস্পরপরিবর্তনীয়তার এই দর্শনের ওপর নির্ভর করেই পিথাগোরীয়দের প্রাথমিক গ্রহমডেল তৈরি হয়। পিথাগোরাস বললেন, পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। আর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্ররা ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। যার প্রতিটি আছে নিজ নিজ গোলকে (চিত্র ৮)। গোলকগুলোর সাইজের অনুপাত ছিল সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। গোলকের চলনের তালে তালে তৈরি হত সঙ্গীত। সবচেয়ে বাইরের গ্রহ বৃহস্পতি ও শনি৩ ঘুরত সবচেয়ে জোরে। ফলে এদের স্বরগ্রামের সুর হয় সবচেয়ে বেশি। চাঁদের মতো সবচেয়ে ভেতরের দিকের বস্তুগুলোর সুর ছিল হালকা। সবমিলিয়ে চলমান গ্রহুগুলো গোলকের মধ্যে একটি ঐকতান তৈরি করেছিল। আর মহাকাশে বাজে সুন্দর সুন্দর সব গাণিতিক গীত। 'সবকিছুই সংখ্যা' বলে পিথাগোরাস এটাই বুঝিয়েছিলেন।

চিত্র ৮: গ্রিক মহাবিশ্ব

প্রকৃতিকে জানার মূল মাধ্যম ছিল অনুপাত। এ কারণে পিথাগোরীয় এবং তাদের পরে গ্রিক গণিতবিদরা অনুপাতের বৈশিষ্ট্য জানার প্রচেষ্টা চালিয়েই বেশিরভাগ সময় পার করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা অনুপাতকে ১০টি আলাদা ভাগে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে একটি নাম হোল তরঙ্গ গড়। এমন একটি গড়ই বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর৪ সংখ্যা তৈরি করেছে। এটা হলো সোনালী অনুপাত (Golden ratio)।

মোহনীয় এই গড়টি পেতে হলে একটি রেখাকে বিশেষ উপায়ে বিভক্ত করতে হবে। একে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে ছোট ও বড় অংশের অনুপাত বড় অংশ ও পুরো অংশের অনুপাতের সমান হয় (দেখুন পরিশিষ্ট খ)। এভাবে বললে জিনিসটাকে তেমন কিছু মনে হয় না। কিন্তু এই অনুপাত থেকে পাওয়া ছবিগুলোকে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস মনে হয়। এমনকি আজকের দিনেও স্থপতিরা সহজাতভাবেই জানেন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই অনুপাত মেনে বানানো স্থাপনা সবচেয়ে নান্দনিক হয়। এ কারণেই শিল্প ও স্থাপত্যের বহু জায়গায় এই অনুপাতের ব্যবহার দেখা যায়। কিছু কিছু ইতিহাস ও গণিতবিদের মতে পার্থানন নামের রাজকীয় অ্যাথেনীয় মন্দির এমনভাবে বানানো হয়েছিল যাতে এর প্রতিটি দিকেই সোনালী অনুপাত দৃশ্যমান হয়। এমনকি প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশলেও দেখা যায় সোনালী অনুপাতের উপস্থিতি। শামুকজাতীয় প্রাণীদের পরপর দুটি প্রকোষ্ঠের আকারের অনুপাত তুলনা করুন। অথবা আনারসের ডানাবর্তী ও বামাবর্তী খাঁজগুলোর অনুপাত দেখুন। দেখা যাবে এই অনুপাত সোনালী অনুপাতের খুব কাছাকাছি।

পেন্টাগ্রাম হয়ে ওঠে পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের সবচেয়ে পবিত্র প্রতীক। এর কারণ হলো পেন্টাগ্রামের রেখাগুলোও এই বিশেষ উপায়ে গঠিত। সোনালী অনুপাত দিতে পরিপূর্ণ। আর পিথাগোরাস মনে করতেন সোনালী অনুপাত হলো সব সংখ্যার রাজা। শিল্পী ও প্রকৃতির কাছে সোনালী অনুপাত সমানে ভালবাসা পায়। এ যেন পিথাগোরাসের কথারই প্রতিধ্বনি: সঙ্গীত, সৌন্দর্য, স্থাপত্য ও মহাবিশ্বেরই গঠন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ও অবিচ্ছেদ্য। পিথাগোরীয়দের মতে অনুপাতই মহাবিশ্বের নিয়ন্তা। আর একসময় যা শুধু ভাবত পিথাগোরীয়, অল্পদিনের মাথায়ই তা পুরো পাশ্চাত্য বিশ্বের ভাবনা হয়ে দাঁড়াল। নান্দনিকতা, অনুপাত ও মহাবিশ্বের অতিপ্রাকৃত সম্পর্ক পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি প্রধান ও দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসে পরিণত হলো। শেক্সপিয়রের সময় পর্যন্তুও বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনুপাতের কক্ষপথের প্রদক্ষিণ নিয়ে কথা বলতেন। বলতেন স্বর্গীয় গীতের কথা। যার সুর প্রবাহিত হত পুরো মহাবিশ্বে।

চিত্র ৯: পার্থানন, শামুকের খোলস ও সোনালী অনুপাত

পিথাগোরীয় সংস্কৃতিতে শূন্যের কোনো স্থান ছিল না। সংখ্যা ও আকৃতির সমতুল্যতা প্রাচীন গ্রিকদেরকে জ্যামিতির নায়ক বানিয়েছিল। কিন্তু এতে ছিল বড় একটি অসুবিধে। এ ধারণার কারণে শূন্যকে সংখ্যা বিবেচনার কথাটি কারও মাথায় আসেনি। শূন্যের আবার কিসের আকৃতি থাকবে?

দুই একক দৈর্ঘ্য ও দুই একক প্রস্থের একটি বর্গ কল্পনা করা খুব সহজ। কিন্তু শূন্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি বর্গ কেমন হবে? দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নেই, নেই কোনো উপাদানও- এমন কিছুকে বর্গ হিসেবে কল্পনা করা কঠিন একটি কাজ। ফলে শূন্য দিয়ে গুণ করাও ছিল অর্থহীন কাজ। দুটি সংখ্যাকে গুণ করা মানেই একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া। কিন্তু শূন্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি আয়তের ক্ষেত্রফল কত হতে পারে?

বর্তমানে গণিতের বড় বড় অমীমাংসিত সমস্যাগুলোকে উপস্থাপন করা হয় গণিতবিদদের পক্ষে সমাধানের অযোগ্য অনুমান (conjecture) আকারে। তবে প্রাচীন গ্রিসে সংখ্যা-আকৃতিগুলো ভিন্ন একটি চিন্তার উপায় খুলে দিয়েছিল। সে সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত অমীমাংসিত সমস্যাটি ছিল জ্যামিতির। শুধু কম্পাস ও রুলার দিয়ে আপনি কি এমন একটি বর্গ আঁকতে পারবেন, যার ক্ষেত্রফল একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান? এই যন্ত্রগুলো দিয়ে আপনি কি একটি কোণকে তিন ভাগ করতে পারবেন? জ্যামিতিক গঠন ও আকৃতি ছিল একই জিনিস। শূন্য ছিল এমন একটি সংখ্যা যার কোনো রকম জ্যামিতিক অর্থ থাকতে পারে বলে মনে করা হত না। তার মানে শূন্যকে ঠাঁই দিতে হলে গ্রিকদেরকে পুরো গাণিতিক কাজের পদ্ধতিই পাল্টে ফেলতে হত। তারা সেটা না করল না।

গ্রিক পদ্ধতিতে শূন্য যদি থেকেও থাকত, তবুও শূন্যকে দিয়ে অনুপাত বানানোকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ মনে হত। দুটি বস্তুর সম্পর্ককে কে আর অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যেত না। শূন্য ও অন্য যে কোনো সংখ্যার অনুপাত, মানে শূন্যকে যে কোনো সংখ্যাকে দিয়ে ভাগ দিলে প্রাপ্ত সংখ্যা হবে শূন্যই। অন্য সংখ্যাটিকে শূন্য একেবারেই গিলে ফেলে। আর এদিকে কোনোকিছু ও শূন্যের অনুপাত, মানে কোনো একটি সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যুক্তিই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পরিচ্ছন্ন পিথাগোরীয় মহাবিশ্বে শূন্য একটুখানি ময়লা জমিয়ে দেয়। এ কারণেই শূন্যকে বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি।

আসলে গ্রিকরা আরেকটি অসুবিধাজনক গাণিতিক ধারণাকেও ঘৃণা করে এসেছিল। মূলদ সংখ্যা। পিথাগোরীয় চিন্তায় প্রথম বাধা ছিল এটিই। তারা এটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। আর এই জিনিসটা প্রকাশ্যে চলে এলে তারা সহিংস হয়ে উঠল।

অমূলদ সংখ্যার ধারণা গ্রিক গণিতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল টাইম বোমার মতো। সংখ্যা ও আকৃতির দ্বৈততার কারণে গ্রিকদের কাছে গণনা আর রেখার দৈর্ঘ্য মাপা ছিল একই কাজ। এ কারণে দুটি সংখ্যার অনুপাত বের করতে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের দুটি রেখাকে তুলনা করাই যথেষ্ট ছিল। তবে যেকোনো ধরনের পরিমাপ করতে গেলেই একটি আদর্শ দরকার হয়। এমন একটি মাপকাঠি, যেটা দিয়ে দুটি রেখার সাইজ তুলনা করা যাবে। উদাহরণ হিসেবে ধরুন, একটি রেখার দৈর্ঘ্য বরাবর এক ফুট। এর এক প্রান্ত থেকে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দূরে একটি দাগ দিলেন। এর ফলে আগের এক ফুট এখন দুটি অসমান খণ্ডে বিভক্ত হলো। গ্রিকরা এই অনুপাত বের করার জন্যে রেখাটিকে খণ্ডে ভাগ করত। অর্ধ-ইঞ্চি বা এমন কিছুকে ব্যবহার করত আদর্শ বা মাপকাঠি হিসেবে। ফলে এক অংশে থাকবে ১১টি দাগ, আর আরেক অংশে ১৩টি।৫ অতএব, দুই অংশের অনুপাত হবে ১১:১৩।

পিথাগোরাসের প্রত্যাশা অনুসারে মহাবিশ্বের সবকিছুকে অনুপাত মেনে চলতে হলে মহাবিশ্বের অর্থবহ সবকিছুকে সুন্দর ও সরল অনুপাতের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। তাকে হতে হবে মূলদবা যৌক্তিকসংখ্যা (rational number)৬। আরও স্পষ্ট করে বললে, এই অনুপাতগুলোকে a/b আকারে লিখতে হত। যেখানে a ও b হবে ১, ২ বা ৪৭-এর মতো দেখতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন গণনা (স্বাভাবিক৭) সংখ্যা। (গণিতবিদরা খুব সাবধান! এ জন্যে বলেই রাখেন, b এর মান শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে ভাগ দিতে হবে শূন্য দিয়ে, যা এক ভয়ানক কাজ।) বলাই বাহুল্য, মহাবিশ্ব এতটা সাজানো-গোছানো নয়। কিছু কিছু সংখ্যাকে a/b ধরনের সরল ভগাংশ আকারে লেখা সম্ভব হয় না। এই অমূলদ সংখ্যাগুলো ছিল গ্রিক গণিতের অনিবার্য ফল।

বর্গ জ্যামিতির অন্যতম সরল একটি চিত্র। পিথাগোরীয়রা একে যথাযথ সম্মানও দিত। (চারটি মৌলিক উপাদানের আদলে এর ছিল চারটি বাহু। এটা ছিল নিখুঁত সংখ্যার প্রতীক।) কিন্তু বর্গের সারল্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মূলদ সংখ্যা। বর্গের বিপরীত কোণাকে যুক্ত করে কর্ণ আঁকলেই চলে আসে অমূলদ সংখ্যা। মনে করুন, একটি বর্গের সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য ১ ফুট করে। মনে মনে (বা বাস্তবেই) এটা এঁকে ফেলুন। গ্রিকদের মতো অনুপাতে নিমগ্ন থাকা মানুষ বর্গের বাহু ও কর্ণের দিকে জিজ্ঞেস করবে: এই দুটি রেখার অনুপাত কত?

আগের মতোই প্রথম কাজ হলো একটি আদর্শ মাপকাঠি তৈরি করা। সেটা হতে পারে অর্ধ-ইঞ্চির একটি ছোট্ট রুলার। এবার কাজ হলো সেই মাপকাঠি দিয়ে প্রতিটি বাহুকে সমান সমান ভাগে বিভক্ত করা। অর্ধ-ইঞ্চির মাপকাঠি দিয়ে আমরা এক ফুটের (১২ ইঞ্চি) বাহুকে ২৪ খণ্ড করতে পারব, যার প্রতিটি অর্ধ-ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু কর্ণকে মাপলে কী হবে? একই মাপকাঠি দিয়ে কর্ণের দৈর্ঘ্যকে মাপলে ৩৪টির মতো খণ্ড পাওয়া যাবে। কিন্তু পুরোপুরি মিলবে না। ৩৪তম খণ্ডটি হবে সামান্য ছোট। অর্ধ-ইঞ্চির রুলার বর্গের কোণা দিয়ে একটুখানি বেরিয়ে থাকবে। আমরা আরও ভালোভাবেও মাপতে পারব। রেখাটিকে আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করলেই হবে। ধরুন, আমরা ব্যবহার করলাম এক ইঞ্চির ৬ ভাগের এক ভাগ সমান একটি রুলার। এবার বর্গের বাহু ৭২ খণ্ডে বিভক্ত হবে। আর কর্ণে খণ্ড পাওয়া যাবে ১০১টির বেশি। তবে ১০২টির কম। এবারেও পরিমাপ নিখুঁত হবে না। আরও অনেক ছোট মাপকাঠি নিলে কী হবে? এক ইঞ্চির দশ কোটি ভাগের ভাগ সমান দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি নিলে? বর্গের বাহু হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ খণ্ড। আর কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে ১৬,৯৭,০৫,৬৩ খণ্ডের চেয়ে একটু কম। এই রুলার দিয়েও রেখা দুইটির মধ্যে সমন্বয় করা যাচ্ছে না। আসল কথা হলো, কোনো রুলার দিয়েই সঠিক পরিমাপ পাওয়া যাবে না।

আসলে আপনি রুলার যত ছোটই করেন না কেন, বর্গের বাহু ও কর্ণ উভয়কে নিখুঁতভাবে মাপার মতো একটি মাপকাঠি কখনোই পাওয়া যাবে না। কর্ণ ও বাহু একই সাথে অনির্ণেয়। কিন্তু একই মাপকাঠি না হলে দুটি রেখাকে অনুপাত আকারে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। একক সাইজের একটি বর্গের জন্যে এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা একম কোনো গণন সংখ্যা a ও b পাব না যারা বর্গের যথাক্রমে বর্গের বাহু ও কর্ণ হবে এবং যাদেরকে a/b আকারে প্রকাশ করা যাবে। অন্য কথায়, এই বর্গের কর্ণ একটি অমূলদ সংখ্যা। আমরা আজকাল একে দুইয়ের বর্গমূল হিসেবে চিনি।

এটা পিথাগোরীয় গণিতের জন্যে অশনি সঙ্কেত। প্রকৃতি কীভাবে অনুপাত দিয়ে পরিচালিত হবে, যেখানে বর্গের মতো একটি সরল জিনিস অনুপাতের ভাষাকে গোলমেলে কোরে ফেল? এই জিনিসটি বিশ্বাস করা পিথাগোরীয়দের জন্যে ছিল কঠিন। কিন্তু একে অস্বীকার করার যে জো নেই। এটা তাদের প্রিয় গাণিতিক বিধিরই একটি ফল। গণিতের ইতিহাসের অন্যতম প্রথম একটি প্রমাণই হলো বর্গের কর্ণের অপরিমাপযোগ্যতা বা অমূলদতা।

পিথাগোরাসের কাছে অমূলদ সংখ্যারা ছিল ভয়াবহ। কারণ, অনুপাত-মহাবিশ্ব পড়ে গিয়েছিল হুমকির মুখে। কফিনে আরেকটি পেরেক যুক্ত হয় যখ পিথাগোরাস দেখলেন সোনালী অনুপাতও অমূলদ সংখ্যা। অথচ এই সংখ্যাটিই পিথাগোরীয়দের কাছে সৌন্দর্য ও যুক্তির চূড়ান্ত প্রতীক ছিল। এই ভয়ানক সংখ্যাগুলো যাতে পিথাগোরীয় মতবাদের ক্ষতি না পারে সেজন্যে এদেরকে গোপন রাখা হলো। পিথাগোরীয় সঙ্ঘের সবাইকে এমনিতেই কম কথা বলতে হত। এমনকি লিখিত নোট রাখার অনুমতিও ছিল না কারও। দুইয়ের বর্গমূলের অপরিমাপযোগ্যতা হয়ে উঠল সবচেয়ে বড় ও কলুষিত গোপনীয় বিষয়।

তবে গ্রিকরা অমূলদ সংখ্যাকে শূন্যের মতো এত সহজে অবহেলা করে থাকতে পারেনি। সব ধরনের জ্যামিতিক চিত্রে ঘুরেফিরে এদের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল। জ্যামিতি ও অনুপাত নিয়ে এতটা নিমগ্ন থাকা একটা জাতির কাছ থেকে অমূলদ সংখ্যাকে খুব বেশি দিন লুকিয়ে রাখা কঠিন। একদিন না একদিন কেউ একজন ব্যাপারটা ফাঁস করে ফেলতই। এই কেউ একজন ছিলেন মেটাপন্টাম এলাকার হিপাসাস। তিনিও ছিলেন পিথাগোরীয় সঙ্ঘের একজন গণিতবিদ। অমূলদ সংখ্যার রহস্য ফাঁস করে তাকে মারাত্মক বিপাকে পড়তে হয়েছিল।

হিপাসাসের বিশ্বাসঘাতকতা ও চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে প্রচলিত গল্পগুলো খুব অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। গণিতবিদরা আজও অমূলদ সংখ্যার রহস্যা ফাঁস করা দূর্ভাগা এই গণিতবিদের কথা বলেন। কেউ কেউ বলেন পিথাগোরাস তাকে জাহাজ থেকে ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাঁর মতে, নান্দনিক এক গাণিতিক তত্ত্বকে অসুন্দর তথ্য দিয়ে ধ্বংস করার উচিত শাস্তি এটাই। প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায়, পাপের শাস্তি হিসেবে সমুদ্রে ডুবে মরেছিলেন হিপাসাস। কেউ কেউ আবার বলছেন, তাকে সমাজচ্যুত করা হয় এবং তার জন্যে একটি কবর নির্মাণ করা হয়। এভাবে তাকে সমাজ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। তবে হিপাসাসের সত্যিকার পরিণতি যাই হোক না কেন, এটা সত্যি যে তার সঙ্গীরা তাকে তিরস্কার করেছিল। তিনি যা ফাঁস করলেন সেটা পিথাগোরীয় মতবাদের ভিতকেই কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু অমূলদ সংখ্যাকে একটি ব্যতিক্রম বলে চালিয়ে দিয়েই পিথাগোরীয়রা মহাবিশ্ব সম্পর্কে নিজেদের ভাবনাকে কলুষিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারত। এবং সত্যি বলতে সময়ের সাথে সাথে গ্রিকরা অমূলদ সংখ্যাকে নিজেদের সংখ্যার অংশ বানিয়ে নিতে নিমরাজি হয়। পিথাগোরাসকে অমূলদ সংখ্যারা মারেনি। মেরেছে শিম।

হিপাসাসের মতোই পিথাগোরাসের মৃত্যুর বর্ণনাও অস্পষ্ট। তবে সবগুলোই বলছে, মৃত্যুটা হয়েছিল অস্বাভাবিক উপায়ে। কেউ কেউ বলেন, পিথাগোরাস উপবাস থেকে থেকে মারা গিয়েছেন। তবে গল্পের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সংস্করণ অনুসারে তার মৃত্যুর কারণ ছিল শিম। গল্পের একটি সংস্করণ অনুসারে, একদিন শত্রুরা (যাদেরক পিথাগোরাসের সামনে আসতে দেওয়ার যোগ্য মনে না করায় তারা রেগে ছিল) তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর সঙ্ঘের লোকেরা প্রাণভয়ে এদিক-সেদিক ছুটে যায়। উত্তেজিত জনতা পিথাগোরীয়দের একের পর এক জবাই করতে থাকে। ভ্রাতৃসঙ্ঘ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। পিথাগোরাস নিজেও জীবন বাঁচাতে পালাতে লাগলেন। পালিয়ে যেতে পারতেন। যদি না আটকে পড়তেন শিমক্ষেতে। সেখানেই থেমে গেলেন তিনি। ঘোষণা দিলেন, মারা গেলে যাবেন, কিন্তু শিমক্ষেতে পারই দেবেন না। পেছন পেছন আসা মানুষগুলো তো খুব খুশি। তারা দিল গলা কেটে।

সঙ্ঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। নেতা মারা গেলেন। কিন্তু পিথাগোরাসের মূল শিক্ষা বেঁচে রইল। অল্প দিনের মধ্যেই সেটি পাশ্চাত্য ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শনে পরিণত হলো। সেই দর্শনের নাম এরিস্টটলীয় মতবাদ। যা টিকে থেকেছিল পরের দুই হাজার বছর। শূন্যের সাথে এই মতবাদের সংঘর্ষ হয়। তবে অমূলদ সংখ্যাকে উপেক্ষা করা না গেলেও শূন্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল। গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতির সংখ্যা ও আকৃতির দ্বৈতরূপ কাজটিকে সহজ করে দেয়। কারণ শূন্যের তো আর কোনো আকৃতি ছিল না। ফলে এর পক্ষে সংখ্যা হওয়াও সম্ভব ছিল না।

তবুও শূন্যের স্বীকৃতি কিন্তু গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতি ঠেকিয়ে রাখেনি। রাতের আকাশ নিয়ে মগ্ন থাকার কারণে গ্রিকরা শূন্য নিয়ে জানতে পেরেছিল। বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষের মতোই গ্রিকরা রাতের আকাশ দেখত। আর রাতের আকাশে সবার আগে হাত পাকিয়েছিল ব্যাবিলনীয়রা। তারা সূর্য ও চন্দ্রগহণের পূর্বাভাস দেওয়ার উপায় জানত। প্রথম গ্রিক জ্যোতির্বিদ থ্যালিস এটা শিখেছিলেন ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে। কিংবা হয়ত মিশরীয়দের মাধ্যমে শিখে থাকবেন। বলা হয়ে থাকে, খৃষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালে তিনি একটি সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাস প্রদান করেছিলেন।

ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সাথে এসেছিল ব্যাবিলনীয় সংখ্যাও। জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনে গ্রিকরা ষাটভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। ঘণ্টাকে ভাগ করেছিল ৬০ মিনিটে। আর মিনিটকে ৬০ ভাগে। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালের দিকে ব্যাবিলনীয় লেখালেখিতে শূন্যের আবির্ভাব ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রিক জ্যোতির্বিদরাও এর ব্যবহার শুরু করে দেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার স্বর্ণযুগে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার টেবিলগুলোতে শূন্যের ব্যবহার ছিল খুব সাধারণ ঘটনা। এর প্রতীক ছিল ছোট হাতের ওমাইক্রোন oর মতো। যা দেখতে অনেকটাই আধুনিক যুগের শূন্যের মতোই। যদিও এটা হয়ত নিছকই কাকতালীয় ঘটনা। (সম্ভবত ওমাইক্রোনের ব্যবহার শুরু হয়েছে 'কিছু না' এর গ্রিক প্রতিশব্দ ouden এর প্রথম অক্ষর থেকে। গ্রিকরা শূন্যকে মোটেই পছন্দ করত না। ব্যবহার করত যতটা সম্ভব কম। ব্যাবিলনীয় প্রতীক দিয়ে হিসাব-নিকাশ করের পরে গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সাধারণত সংখ্যাগুলোকে আবারও গুরুগম্ভীর গ্রিক সংখ্যায় রূপান্তর করে নিত। যেখানে শূন্য থাকত অনুপস্থিত। প্রাচীন পাশ্চাত্য সংখ্যাপদ্ধতিতে শূন্য কখনোই স্থান পায়নি। এ কারণে ওমাইক্রোন শূন্যের (0) আদিরূপ হবে তার সম্ভাবনা কম। হিসাব করতে গিয়ে গ্রিকরা শূন্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। তবুও প্রত্যাখ্যান করতে বাঁধেনি।

তার মানে গ্রিকরা কিন্তু অজ্ঞতার কারণে শূন্যকে প্রত্যাখ্যান করেনি। করেনি সংখ্যা-আকৃতির সীমাবদ্ধতার কারণেও। এটা ছিল তাদের দর্শনের ফল। পাশ্চাত্যের মৌলিক দার্শনিক বিশ্বাসের সাথে শূন্যের সঙ্ঘাত হয়। কারণ শূন্যের মধ্যে এমন দুটি ধারণা আছে যা পাশ্চাত্য মতবাদের জন্যে হুমকি। এবং এই ধারণাগুলোই এরিস্টটলীয় দর্শনের দীর্ঘ সময় ধরে চলা প্রভাবকে শেষ করে দেয়। এই ভয়ানক ধারণাগুলো হলো শূন্যতা ও অসীম।

অসীম, শূন্যতা ও পাশ্চাত্য

প্রকৃতিবিদরা মাছি পর্যবেক্ষণ করেন

আছে এর চেয়ে ছোট মাছি যা তাকে শিকার করে

তার চেয়েও ছোট মাছিও আছে যা তাকে কামড় দেয়।

এভাবেই চলে অসীম পর্যন্ত...

-জোনাথন সুইফট, *অন পয়েট্রি অ্যান্ড রাফসডি*

অসীম ও শূন্যতার শক্তি নিয়ে গ্রিকরা ছিল আতঙ্কিত। সব ধরনের গতিকে অসম্ভব করে তুলছিল অসীম। অন্য দিকে শূন্যতা হুমকি দিচ্ছিল গুচ্ছবদ্ধ মহাবিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলার। শূন্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে গ্রিক তাদের মহাবিশ্বকে দুই হাজার বছর টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

পিথাগোরাসের মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনের কেন্দ্রীয় বস্তু হয়ে ওঠে। মহাবিশ্বের সবগুলো তত্ত্বে ছিল অনুপাত ও আকৃতির ছড়াছড়ি। গ্রহরা চলত আকাশের গোলকে। চলতে চলতে তৈরি করত সঙ্গীত। কিন্তু এই গোলকগুলোর বাইরে কী আছে? আরও আরও গোলক? প্রতিটা আগের চেয়ে বড় বড়? নাকি শেষ গোলকেই মহাবিশ্বের সমাপ্তি? এরিস্টটল ও অন্যান্য দার্শনিকরা জোর দিয়ে বলতেন, একের পর এক অসীমসংখ্যক গোলক থাকা সম্ভব নয়। এই দর্শন মেনে নিয়ে পাশ্চাত্য বিশ্ব অসীমকে মাথা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। তারা একে একাবারেই অস্বীকার করত। ওদিকে ইলিয়া শহরের জেনোর কল্যাণে অসীম পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল। জেনোর সমসাময়িক মানুষরা তাকে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বিরক্তির মানুষ বলে মনে করত।

জেনোর জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালের দিকে। একই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘটিত প্রচণ্ড সেই পারসিক যুদ্ধগুলোর সূচনা ঘটেছিল। গ্রিস পারস্যকে পরাজিত করে। গ্রিক দর্শন জেনোকে কখনোই সেভাবে পরাজিত করতে পারেনি। কারণ জেনোর কাছে ছিল একটি প্যারাডক্স। একটি যুক্তিভিত্তিক ধাঁধা যা গ্রিক দার্শিনিকরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে অক্ষম ছিলেন। এটাই ছিল গ্রিসের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণাদায়ক তর্ক: জেনো অসম্ভবকে প্রমাণ করেছেন।

জেনোর মতে, মহাবিশ্বের কোনও কিছুই চলাচল করতে পারে না। অব্শ্যই এটি একটি ছেলেমানুষি কথা। একটুখানি হেঁটে যে কেউই একে ভুল প্রমাণ করে দিতে পারেন। সবাই জানত জেনোর কথা ভুল। কিন্তু যুক্তির ভুলটা কেউই দেখাতে পারেনি। তিনি একটি প্যারাডক্স নিয়ে আসেন। জেনোর যুক্তির ধাঁধাঁগুলো গ্রিক দার্শনিকদের বিমূঢ় করে দেয়। বাদ যায় পরবর্তী যুগের দার্শনিকরাও। প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত জেনোর ধাঁধাঁগুলো গণিতবিদদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছিল।

সবচেয়ে বিখ্যাত ধাঁধাঁটার কথা বলা যাক। এটায় তি নি দেখান, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা একটি কচ্ছপ গতিমান একিলিসের চেয়ে একটু আগে চলা শুরু করলে একিলিস কখনোই আর তাকে পেছনে ফেলতে পারেন না। আরও ভাল করে বুঝতে কিছু সংখ্যা ব্যবহার করি। ধরুন, একিলিস সেকেন্ডে এক ফুট চলছেন। আর কচ্ছপ যাচ্ছে তার অর্ধেক গতিতে। আরও ধরুন, কচ্ছপ একিলিসের এক ফুট সামনে থেকে চলা শুরু করল।

একিলিস তীব্র বেগে এগিয়ে গেলেন। এক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি পৌঁছে গেলেন যেখানে একটু আগে কচ্ছপটি ছিল। তবে কচ্ছপটিও তো চলছে। ফলে একিলিস কপচ্ছপের আগের অবস্থানে যেতে যেতে কচ্ছপ আরও এক অর্ধফুট সামনে চলে গেছে। তাতে কী? একিলিস তো আরও দ্রুত চলেন। তাই এই অর্ধফুট দূরত্ব সে অর্ধসেকেন্ডেই পার হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে কচ্ছপ আরও সামনে চলে গেছে। এবার গেছে সিকি ফুট। সিকি সেকন্ডেই একিলিস সেটাও পার হলো। কিন্তু কচ্ছপ ততক্ষণে আবারও সামনে চলে গেছে। এবার এক ফুটের আট ভাগের এক ভাগ। একিলিস দৌড়েই চলছেন। কিন্তু কচ্ছপ থাকছে সামনেই। একিলিস কচ্ছপের যতই কাছে যান, কচ্ছপ ততই আগের জায়গায় থেকে আরও সামনে চলে যায়। এক ফুটের আট ভাগের এক ভাগ, তারপর ষোল ভাগের এক ভাগ, ... ক্রমশ ছোট ছোট দূরত্ব। একিলিস কাছাকাছি হচ্ছেন, কিন্তু কচ্ছপকে ধরতে পারছেন না। সামনে সবসময় কচ্ছপই।

সবাই জানেন, বাস্তবে একিলিস কচ্ছপকে পার হয়ে যাবেন নিমিষেই। কিন্তু জেনোর যুক্তি থেকে মনে হয় সেটা হবে না কখনও। সে যুগের দার্শনিকরা সে যুক্তিকে ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। জানতেন জেনোর যুক্তির ফল ভুল। কিন্তু প্রমাণের গাণিতিক ভুলটাকে ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি (চিত্র ১০)।

সমস্যাটি গ্রিকদের কুপোকাত করে দেয়। তবে সমস্যাটির মূল উৎস কিন্তু তারা খুঁজেই পায়নি। সেটা হলো অসীম। জেনোর প্যারাডক্সের ভেতর লুকিয়ে আছে অসীম। জেনো চলমান গতিকে অসীমসংখ্যক বার ভাগ করেছেন। এখানে অসীমসংখ্যক পদক্ষেপ দরকার জেনে গ্রিকরা ধরে নিয়েছিল রেস চিরকাল ধরে চলতে থাকবে। যদিও প্রতি পদক্ষেপে ধাপগুলো ছোট হচ্ছে। তারা মনে করেছিল, রেস কখনোই শেষ হবে না। আসলে অসীম নিয়ে কাজ করার গাণিতিক হাতিয়ার প্রাচীন মানুষের কাছে ছিল না। কিন্তু আধুনিক গণতিবিদরা সে উপায়টা বের করেছেন। অসীম নিয়ে কাজ করতে হয় খুব সাবধানে। তবে একে বশে আনা যায়। লাগবে শূন্যের সাহায্য। ২,৪০০ বছরের গাণিতিক চর্চার কাঁধে ভর করে জেনোর একিলিস ধাঁধাঁয় ফিরে যাওয়া এখন আর কঠিন নয়।

গ্রিকদের কাছে শূন্য ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আর জেনোর ধাঁধাঁ সমাধানের শূন্যই মূল হাতিয়ার। অনেক সময় অসীমসংখ্যক পদ যোগ করেও সসীম একটি ফল পাওয়া যায়। তবে সেটা হতে হলে পদগুকে ক্রমেই শূন্যের কাছাকাছি যেতে হবে। একিলিস ও কচ্ছপের ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে। একিলিসের চলার পথগুলো যোগ করতে শুরু করতে হয় ১ দিয়ে। তারপর যোগ হবে ১/২, তারপর ১/৪, তারপর ১/৮,... এভাবেই চলবে। পদগুলো ক্রমেই ছোট হবে। আর কাছাকাছি হবে শূন্যের। প্রতিটি পদ যেন কোন ভ্রমণের অংশ। যার গন্তব্য শূন্য। কিন্তু গ্রিকরা শূন্যকে বর্জন করেছিল বলে বুঝতে পারেনি এই ভ্রমণের শেষ কোথায়। তাদের কাছে মনে হয়নি, ১/২, ১/৪, ১/৮,... সংখ্যাগুলো কোনও একটি সংখ্যার নিকটবর্তী হচ্ছে। কোনও গন্তব্য নেই। তারা শুধুই দেখেছে, পদগুলো ক্রমশ ছোট হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সংখ্যার জগৎ থেকে দূরে কোথাও।

আধুনিক গণিতবিদরা জানেন, পদগুলোর একটি সীমা (limit) আছে। ১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬, … সংখ্যাগুলোর সীমা হলো শূন্য, যার দিকে এরা এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে চলার একটা গন্তব্য আছে। কোনও ভ্রমণের গন্তব্য থেকে থাকলে জিজ্ঞেস করা যেতেই পারে, গন্তব্যটা কত দূরে আছে। আর সেখানে পৌঁছতে কত সময় লাগবে। একিলিসের চলার পথের দূরত্বগুলো যোগ করা কঠিন নয়। ১+১/২+১/৪+১/৮+১/১৬+...। একইভাবে একিলিসের প্রতিটি পদক্ষেপ ক্রমেই ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে। হচ্ছে ক্রমেই শূন্যের আরও কাছাকাছি। পদক্ষেপগুলোর যোগফল ক্রমেই ২ এর কাছাকাছি হচ্ছে। এটা আমরা কীভাবে জানলাম? আচ্ছা, ২ থেকে শুরু করে দেখুন। এবার যোগফলে একে একে পদগুলোকে বিয়োগ দিতে থাকুন। প্রথমে বিয়োগ হবে ১। তারপরে ১/২। বাকি থাকবে বাকি ১/২। এবার বিয়োগ করুন ১/৪। তাহলে আর বাকি থাকবে ১/৪। এখান থেকে ১/৮ বিয়োগ করলে থাকবে ১/৮। আমারা আমাদের চেনা ধারায় ফিরে যাচ্ছি। আমরা জানিই, ১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ... ধারার সীমা হলো শূন্য (০)। অতএব, পদগুলোকে ২ থেকে বিয়োগ করতে থাকলে কিছুই আর বাকি থাকবে না। ১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ... ধারার যোগফলের সীমা হলো ২ (চিত্র ১১)। কচ্ছপকে ধরতে একিলিসকে ২ ফুট যেতে হবে। যদিও এর মধ্যেই তাকে অসীম সংখ্যক পদক্ষেপ ফেলতে হবে। এছাড়াও সময়ের দিকেই দেখুন না। কচ্ছপকে পার হতে একিলিসের কতটুকু সময় লাগবে দেখুন: ১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ...। মানে ২ সেকেন্ড। একটি সসীম দূরত্ব পার হতে একিলিস একই সাথে অসীমসংখ্যক পদক্ষেপ ফেলেন, আবার সেই দূরত্ব পার হন মাত্র ২ সেকেন্ডেই।

চিত্র ১১: ১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ... = ২

দারুণ এই গাণিতিক বুদ্ধিটা গ্রিকদের মাথায় আসেনি। সীমার ধারণা তাদের জানা ছিল না। কারণ তারা শূন্যকে বিশ্বাস করেনি। তারা মনে করত, অসীম ধারার কোনো সীমা বা গন্তব্য থাকতে পারে না। এমন ধারার পদগুলো শুধুই ছোট হতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার দিকে যায় না। এ জন্যেই গ্রিকরা অসীম নিয়ে কাজ করতে পারত না। তারা শূন্যত নিয়ে ভাবত, কিন্তু শূন্যকে সংখ্যা হিসেবে মেনে নেয়নি। ওদিকে তারা অসীম নিয়েও খেলা করেছে। কিন্তু অসীমকে বা যেসব জিনিস অসীম পরিমাণ ছোট বা বড় তাদেরকে সংখ্যার জগতে আসতে দেয়নি। গ্রিক গণিতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এটাই। এ কারণেই তারা ক্যালকুলাস আবিষ্কার করতে পারেনি।

অসীম, শূন্য ও সীমার ধারণা একে অপরের সাথে একটি গুচ্ছে মিশে আছে। গ্রিক দার্শনিকরা সেই গুচ্ছের গিঁট খুলতে পারেনি। এ কারণে জেনোর ধাঁধাঁ সমাধানের জন্যে ভাল কোনো উপকরণ তাদের হাতে ছিল না। কিন্তু জেনোর প্যারাডক্সের জোর ছিল অনেক বেশি। গ্রিকরা বারবার চেষ্টা করেছে সেখান থেকে অসীমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু সঠিক ধারণার অভাবে ব্যর্থতাই লেখা ছিল তাদের কপালে।

জেনোর নিজের কাছেও সমস্যাটির ভাল কোনো সমাধান ছিল না। তিনি সমাধান খোঁজেনওনি। তার দর্শনের জন্যে প্যারাডক্সটি খুব মানানসই। তিনি ছিলেন ইলীয় ভাবধারার চিন্তাবিদ। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা পার্মানিডিজ মনে করতেন, মহাবিশ্ব মৌলিকভাবে পরিবর্তনহীন ও নিশ্চল। দেখা গেল, জেনোর ধাঁধা পার্মানিডিজের যুক্তির পক্ষে কোঠা বলছে। দেখা গেল, পরিবর্তন ও গতি খুবই প্যারাডক্সিকেল ব্যাপার। তিনি মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সবকিছু একই জিনিস। এবং পরিবর্তনহীন। জেনো সত্যিই বিশ্বাস করতেন, গতি অসম্ভব। আর এই কথার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার নিজের প্যারাডক্স।

কিন্তু অন্য মতবাদের পক্ষেও ছিলেন কিছু চিন্তাবিদ। যেমন, পরমাণুবিদরা বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্ব পরমাণু নামে ছোট ছোট কণা দিয়ে গঠিত। পরমাণু চিরন্তন, যাকে আর ভাঙা যায় না। তাদের মতে গতি হলো এই ছোট ছোট পরমাণুর চলাচল। এই পরমাণুদেরকে চলাচল করতে হলে দরকার খালি জায়গা, যেখানে তারা গিয়ে স্থান করে নেবে। ভ্যাকুয়াম বা ফাঁকা স্থান বলে কিছু না থাকলে পরমাণুরা ক্রমাগত একে অপরের সাথে ধাক্কা খাবে। সবকিছুই চিরকাল একই জায়গায় আটকে থাকবে। চলাচল করা হত অসম্ভব। ফলে পরমাণু তত্ত্ব সঠিক হতে হলে মহাবিশ্বে থাকতে হবে ব্যাপক ফাঁকা স্থান। অসীম এক শূন্যতা। পরমাণুবাদীরা অসীম ভ্যাকুয়ামের ধারণাকে লুফে নিয়েছিল। এই ধারণার মধ্যেই অসীম ও শূন্য একাকার হয়েছিল। এ এক অবাক করা ফলাফল। কিন্তু পরমাণু তত্ত্বে বস্তুর অবিভাজ্য মৌলিক অংশ জেনোর প্যারাডক্সকে ভালোভাবেই সামাল দিয়েছিল। পরমাণুরা অবিভাজ্য বলে এমন একটি বিন্দু আছে যার পরে কোনোকিছুকে আর ভাঙা যাবে না। জেনোর ভাঙার কাজ অসীম পর্যন্ত যেতে পারে না। কিছু পদক্ষেপ ফেলার পর একিলিসের পদক্ষেপগুলো এত ছোট হবে, যার পক্ষে আরও ছোট হওয়া সম্ভব নয়। একটা সময় তিনি এমন একটি পদক্ষেপ ফেলবেন যা কচ্ছপের অতিক্রান্ত পথের চেয়ে বেশি। বারবার হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়া কচ্ছপ শেষমেশ ধরা পড়বেই।

পরমাণু তত্ত্বের সাথে টক্কর লাগে আরেকটি দর্শনের। এখানে অসীম ভ্যাকুয়ামের মতো অদ্ভুত কিছু ছিল না। এ ধারণা অনুসারে মহাবিশ্ব ছিল একটি নাদুসনুদুস ছোট্ট জিনিস। নেই কোনও অসীম। কোনও শূন্যতা। আছে শুধু সুন্দর কিছু গোলক। যারা বেষ্টন করে আছে পৃথিবীকে। অবচেতনভাবেই পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল এরিস্টটলীয় ধারণা। পরে আলেক্সান্দ্রীয় জ্যোতির্বিদ টলেমি একে পরিমার্জিত করেন। এটা পাশ্চাত্য বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শনে পরিণত হয়। শূন্য আর অসীমকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে এরিস্টটল জেনোর প্যারাডক্সগুলোকে বাতিল বানিয়ে দেন।

এরিস্টটল নিছক বললেন, গণিতবিদদের অসীমকে দরকার নেই। তারা ব্যবহারও করেন না। হ্যাঁ, গণিতবিদদের মনে সম্ভাব্য কিছু অসীমের অস্তিত্ব থাকতে পারে। যেভাবে থাকে একটি রেখাকে অসীমসংখ্যক বার ভাগ করার ধারণা। কিন্তু সে কাজটি তো আর করা সম্ভব নয়। একইভাবে অসীমও বাস্তবে নেই। একিলিস সহজেই কচ্ছপকে পার হয়ে যান। কারণ অসীমসংখ্যক বিন্দুর বিষয়টি নিছক জেনোর কাল্পনিক তুলির আঁচড়। এটা বাস্তব জগতের কিছু নয়। অসীমকে নিছক মনের মধ্যে অস্তিত্বে থাকা একটি জিনিস দাবি করে এরিস্টটল অসীমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

এ ধারণা থেকে অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি জিনিস বেরিয়ে আসে। এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের (ও পরবর্তীতে টলেমির করা পরিমার্জন) ধারণার ভিত্তি ছিল পিথাগোরীয় মহাবিশ্ব। এ ধারণায় মনে করা হত, গ্রহরা স্ফটিকের মতো গোলকের মধ্যে ঘুরছে। তবে অসীমের অস্তিত্ব নেই বলে এই গোলকের সংখ্যা সীমাহীন নয়। অন্তত একটা অবশ্য থাকবেই। সবচেয়ে বাইরের গোলক ছিল মধ্যরাতে দেখা একটি নীল গ্লোবের মতো। যা ছোট ছোট জ্বলজ্বলে আলোকবিন্দু দিয়ে আবৃত। এই আলোকবিন্দুরা হলো নক্ষত্র। সবচেয়ে বাইরের গোলকের বাইরে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সর্ববাইরের এই স্তরের পরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। মহাবিশ্বটা যেন আবদ্ধ ছিল এক বাদামের খোসায়। যা স্থির নক্ষত্রদের গোলকের ভেতরের সুন্দরভাবে অবস্থান করছিল। মহাবিশ্বটা সসীম। বস্তু দিয়ে পরিপূর্ণ। অসীম বলতে কিছু নেই। শূন্যতা বলতেও কিছু নেই। অসীম নেই বলে নেই শূন্যও।

এই যুক্তি থেকে আরও একটি ফল পাওয়া গেল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত। আর হয়ত এ কারণে এরিস্টটলের দর্শন এতগুলো বছর টিকে থাকতে পেরেছিল।

আকাশের গোলকরা নিজেদের স্থানে ধীরে ধীরে ঘুরছে। এতে করে সঙ্গীত। যা ছড়িয়ে আছে মহাবিশ্বজুড়ে। কিন্তু গোলকদের এই ঘোরার পেছনে নিশ্চয়ই কোনোকিছু ভূমিকা রাখছে। নিশ্চল পৃথিবী সেই ক্ষমতার উৎস হতে পারে না। তাহলে সবচেয়ে ভেতরের গোলক নিশ্চয় তার ঠিক বাইরের গোলক দ্বারা গতিশীল হচ্ছে। সেই গোলক আবার তার পরের গোলকের মাধ্যমে গতিশীল। এভাবেই চলছে। কিন্তু অসীম তো নেই। গোলকের সংখ্যা নির্দিষ্ট। একে অপরকে গতিশীল রাখার জন্যে আছে সসীম সংখ্যক বস্তু। গতির নিশ্চয়ই চূড়ান্ত কোনো উৎস আছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা স্থির নক্ষত্রদের গোলককে ঘোরাচ্ছে। সেটাই প্রধান গতিদাতা ঈশ্বর। পরমাণুবাদের সাথে সম্পর্ক হলো নাস্তিকতার। এরিস্টটলীয় মত নিয়ে প্রশ্ন তোলা ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সামিল।

এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের ধারণা অত্যন্ত সফল ছিল। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় শিষ্য আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট তাঁর মতবাদ প্রচার করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। ৩২৩ খৃষ্টপূর্বে নিজের অকাল মৃত্যুর আগে ছড়িয়ে দেন প্রাচ্যের ভারত পর্যন্ত। আলেক্সান্ডারের সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে টিকে থাকে এরিস্টটলের মতবাদ। টিকে থাকল ষোড়শ শতকের এলিজাবেথের সময় পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময় ধরে এরিস্টটলকে মেনে নেওয়া সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করে আসা হয়েছে অসীম ও শূন্যতাকে। কারণ এরিস্টটলীয় মতবাদে অসীমকে অস্বীকার করতে হলে শূন্যও থাকতে পারে না। শূন্যতার উপস্থিতি বলে অসীম বলেও কিছু একটা আছে। আর যাই হোক, শূন্যতার তো শুধু দুটিই সম্ভাব্য দিক আছে। আর দুটোই বলছে অসীমও থাকবে। প্রথমত, শূন্যতার পরিমাণ হতে পারে অসীম। মানে অসীমের অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়ত, শূন্যতার পরিমাণ সসীম বা নির্দিষ্ট। আর শূন্যতা মানে বস্তুর অনুপস্থিতি। অতএব শূন্যতার পরিমাণ সসীম হতে হলে বস্তুর পরিমাণ অসীম হতে হবে। তাও অসীমের অস্তিত্ব থাকে। দুই ক্ষেত্রেই শূন্যতার অস্তিত্ব অসীমের অস্তিত্বকে অনিবার্য করে তোলে। শূন্য বা শূন্যতা এরিস্টটলের সুন্দর যুক্তিটাকে শেষ করে দেয়। বাতিল করে দেয় তাঁর করা জেনোর বক্তব্যের খণ্ডন আর ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ৮। ফলে গ্রিকরা এরিস্টটলের কথা মানার কারণে শূন্য, শূন্যতা, অসীমকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়।

একটা সমস্যা কিন্তু ছিলই। অসীম ও শূন্য দুটোকেই অবহেলা করা এত সহজ না। সময়ের সুড়ঙ্গ দিয়ে অতীতে ফিরে তাকানো যাক। ইতিহাসের পাতায় কত কত ঘটনা। অসীম বলে কিছু না থাকলে অসীম সংখ্যক ঘটনা থাকা সম্ভব নয়। তাহলে প্রথম ঘটনা বলে কিছু একটা থাকতে হবে। সেটা হবে সৃষ্টির সূচনা। কিন্তু তার আগে কী ছিল? শূন্যতা? কিন্তু এরিস্টটলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কোনো প্রথম ঘটনা না থাকলে মহাবিশ্ব নিশ্চয় সবসময় অস্তিত্বে ছিল। ভবিষ্যতেও থাকলে চিরকাল। অসীম অথবা শূন্যকে মেনে নিতেই হবে। দুটোর অন্তত একটা না থাকলে মহাবিশ্ব অর্থহীন হয়ে যায়।

এরিস্টটল শূন্যতার ধারণাকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। ফলে তিনি শূন্যতাধারী মহাবিশ্বের বদলে চির ও অসীম মহাবিশ্বের পক্ষ নিলেন। তাঁর মতে, সময়ের চিরবহমানতা জেনোর অসীম বিভাজনের৯ মতো একটি সম্ভাব্য অসীম।

ভুল হোক আর যাই হোক, পদার্থবিজ্ঞানের এরিস্টটলীয় ধারণা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে অন্য কোনো মতবাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। বাতিলের খাতায় উঠেছে আরও বাস্তব তত্ত্বও। এরিস্টটলের বানানো পদার্থবিজ্ঞান আর জেনোর অসীমকে অস্বীকারের প্রবণতা থেকে সরে আসার আগে বিজ্ঞান আর অগ্রগতি করতে পারেনি।

বুদ্ধির বিড়ম্বনায় জেনো ভালোই জড়িয়ে পড়েছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৪৩৫ সালে তিনি ইলিয়ার স্বৈরচারী রাজা নিয়ারকসকে উৎখাত করার কাজে তৎপর হন। উদ্দেশ্য সাধনে তিনি অস্ত্র সরবরাহের কাজ করেন। জেনোর দূর্ভাগ্য: নিয়ারকস ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যান। জেনোকে গ্রেফতার করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের বের করতে জেনোর ওপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। অল্পতেই জেনো ভেঙে পড়লেন। সহচরদের ধরিয়ে দিতে রাজি হলেন। নিয়ারকস জেনোর কাছে আসলে জেনো তাকে আরও কাছে আসতে বললেন, যাতে নামগুলো গোপন থাকে। নিয়ারকস সামনে ঝুঁকে জেনোর দিকে মাথা বাড়াল। আচমকা জেনো নিয়ারকসের কানে দাঁত বসিয়ে দিলেন। নিয়ারকস চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু জেনোর কামড় ছাড়ার জো নেই। পাশেরনির্যাতনকারীরা জেনোকে ছুরিকাঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে নিয়ারকসকে উদ্ধ্বার করে। আর এভাবেই মৃত্যু হয় অসীমের মহানায়কের।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আরেকজন গ্রিক দার্শনিক অসীমের ব্যাপারে জেনোকে ছাড়িয়ে যান। তিনি আর্কিমিডিস। সিরাকিউসের খেপা গণিতবিদ। সে সময়ের চিন্তাবিদদের মধ্যে কেবল তিনিই অসীম নিয়ে চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

সিসিলি দ্বীপে সিরাকিউস ছিল সবচেয়ে প্রাচুর্যময় শহর। আর্কিমিডিস ছিলেন এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত বাসিন্দা। তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি খৃষ্টপূর্ব ২৮৭ সালের দিকে সামোসে জন্মগ্রহণ করেন। পিথাগোরাসের জন্মও একই স্থানে। জন্মের পর আর্কিমিডিস সিরাকিউসে পাড়ি জমান। রাজাকে প্রকৌশলগত সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন। সিরাকিউসের রাজাই আর্কিমিডিসকে মুকুট পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। বলতে হবে মুকুটে খাটি সোনা আছে নাকি আছে সীসার মিশ্রণ। এ কাজটি তৎকালীন বিজ্ঞানীদের সাধ্যের অতীত ছিল।

আর্কিমিডিস গোসলের সময় পানির টাবে বসলেন। দেখলেন, টাবের কিনার দিয়ে পানি গড়িয়ে বাইরে পড়ল। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন, মুকুটটি পানিতে ডুবিয়ে এর ঘনত্ব এবং আসলত্বের পরীক্ষা করে ফেলা যায়। খেয়াল করতে হবে কতটুকু পানি বাইরে পড়ে যাচ্ছে। দারুণ উপলদ্ধির প্রভাবে আর্কিমিডিস নগ্ন অবস্থায়ই টাব থেকে লাফিয়ে নেমে সিরাকিউসের রাস্তা ধরে ছুটলেন, "ইউরেকা! ইউরেকা!”

আর্কিমিডিসের মেধা সিরাকিউসের সামরিক বাহিনীরও কাজে এসেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে গ্রিকদের আধিপত্যের ইতি ঘটে। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পতন হয়ে আলাদা আলাদা রাজ্য তৈরি হয়। যারা একে অপরের সাথে বিবাদ করতে থাকে। পাশ্চাত্যে রোমকরা নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করে। রোমকরা সিরাকিউসের দিকে নজর দেয়। গল্পে আছে, আর্কিমিডিস রোমকদের থেকে সিরাকিউসকে রক্ষা করতে নগরবাসীকে অলৌকিক অস্ত্রের যোগান দেয়। এর মধ্যে ছিল পাথর নিক্ষেপক। ছিল ক্রেন, যা রোমকদের জাহাজকে শূন্যে ছুঁড়ে মারত পানিতে। ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের দর্পণ। সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে এ দর্পণ অনেক দূর থেকে রোমকদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। রোমক সৈন্যরা এসব যন্ত্রের খেল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হলো, এসব সৈন্যরা দেয়ালের ওপর দিয়ে কোনো রশি বা কাঠের চিহ্ন দেখলেও ভয়ে পালিয়ে যেত। না জানি আর্কিমিডিস কোন অস্ত্র তাক করবে তাদের দিকে!

আর্কিমিডিস অসীমের দেখা প্রথম পেয়েছিলেন তার যুদ্ধের দর্পণের কাঁচে। কনিক বা চোঙের মতো জিনিসের প্রতি গ্রিকরা বহু শতাব্দী ধরেই আকৃষ্ট ছিল। (কোন হলো ঝালমুড়ির প্যাকেটের মতো। কলার মোচাও একই আকৃতির।--অনুবাদক) একটি কোন নিয়ে একে ব্যাসার্ধ বরাবর কাটুন। কীভাবে কাটছেন তার ওপর নির্ভর করে পাওয়া যাবে বৃত্ত, উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্ত। পরাবৃত্তের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সূর্য বা দূরবর্তী কোনো উৎসের আলোকে এটি একটি বিন্দুতে মিলন ঘটায়। ফলে আলোর সবটুকু শক্তি একটি জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়। জাহাজকে পোড়ানোর জন্যেও পরাবৃত্তের মতো দেখতে একটি দর্পণ লাগবে। আর্কিমিডিস পরাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য জেনেছিলেন। আর ঠিক এখানেই অসীম নিয়ে তাঁর খেলার শুরু।

পরাবৃত্ত বুঝতে গিয়ে আর্কিমিডিসকে এর পরিমাপ করার উপায় শিখতে হয়েছিল। পরাবৃত্তের খণ্ডিত অংশের ক্ষেত্রফল বের করার নিয়ম কারোই জানা ছিল না। ত্রিভুজ ও বৃতের পরিমাপ খুব সহজ ছিল। কিন্তু এর চেয়ে একটি বিষম বাহুর কার্ভের পরিমাপ সে সময়কার গ্রিক গণিতবিদদের সাধ্যের অতীত ছিল। পরাবৃত্তও ছিল তাই। তবে অসীমের আশ্রয় নিয়ে আর্কিমিডিস পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার বুদ্ধি বের করে ফেলেন। প্রথম কাজ হলো পরাবৃত্তের ভেতরে একটি ত্রিভুজ বসিয়ে দেওয়া। এর ফলে দুই দিকে দুটি ছোট ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে। ফাঁকা জায়গা দুটিতে আর্কিমিডিস আরও ত্রিভুজ বসালেন। এর ফলে ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল চারটি। বসানো হলো আরও ত্রিভুজ। এভাবেই চলল খেলা। (চিত্র ১২)

এ যেন একিলিজ ও কচ্ছপের গল্পের মতো।১ যেখানে রয়েছে অসীম সংখ্যক কাজের ধাপ। প্রতিটি ধাপ আগের ধাপের চেয়ে ছোট। ছোট ছোট ত্রিভুজগুলোর ক্ষেত্রফল খুব দ্রুত শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে। অনেকগুলো জটিল হিসাব-নিকাশ শেষে আর্কিমিডিস অসীমসংখ্যক ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি বের করেন। পেয়ে যান পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল। সেসময়ের গণিতবিদদের কাছে কাজটা হাস্যকর। আর্কিমিডিস অসীম নিয়ে খেলা করেছেন। তাঁর গণিতবিদ বন্ধুদের কাছে এ এক নিষিদ্ধ কাজ। তাদেরকে খুশী রাখতে অবশ্য আর্কিমিডিস একটি প্রমাণও হাজির করেছেন। সেময়ের স্বীকৃত গাণিতিক ধারণাই কাজে লাগিয়েছেন তাতে। এতে ব্যবহার করেছেন তথাকথিত আর্কিমিডিসের উপপাদ্য। আর্কিমিডিস অবশ্য স্বীকার করেছেন, এই উপপাদ্য আগের গণিতবিদদের দান। আপনাদের হয়ত মনে আছে, এই উপপাদ্য বলছে, যেকোনো সংখ্যাকে নিজের সাথে বারবার যোগ করলে যোগফল যেকোনো সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে শূন্য অবশ্যই এই নিয়মের মধ্যে পড়বে না।

লিমিট ও ক্যালকুলাস প্রকৃত অর্থে আবিষ্কারের আগে আর্কিমিডিসের ত্রিভুজের মাধ্যমে করা এই প্রমাণই এই ধারণাগুলোর সবচেয়ে কাছাকাছি জিনিস। পরবর্তীতে আর্কিমিডিস রেখার সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান পরাবৃত্ত ও বৃত্তের আয়তনও বের করে দেখান। বর্তমানে ক্যালকুলাসের শিক্ষার্থীরা ক্যালকুলাস শেখার শুরুতেই এসব সমস্যা নিয়ে কাজ করে। কিন্তু আর্কিমিডিসের উপপাদ্যে ছিল না শূন্যের ঠাঁই। অথচ শূন্যই সসীম ও অসীমের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। এমন এক সেতু, যা ক্যালকুলাস ও উচ্চতর গণিতের জন্যে অনিবার্য।

সমকালীনদের মতো আর্কিমিডিসও অনেকসময় অসীমকে তাচ্ছিল্য করেছেন। তিনি এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এ মহাবিশ্ব ছিল বিশাল এক গোলকের অভ্যন্তরে। একবার তার মাথায় চাপল অদ্ভুত এক খেয়াল। তিনি ভাবলেন, পুরো (গোলকীয়) মহাবিশ্বে কতটি বালুকণা আঁটবে তা হিসাব করবেন তিনি। *স্যান্ড রেকোনার* লেখায় তিনি হিসাব কষে দেখলেন, একটি পোস্তদানায় (আফিমের বীজ) কয়টি দানা ধরবে। এরপর বের করলেন কয়টি পোস্তদানা আঙ্গুলের সমান চওড়া হবে। আঙ্গুলের প্রস্থ থেকে গেলেন স্টেডিয়ামের (বেশী দূরত্ব মাপতে এটাই ছিল গ্রিকদের প্রধান একক) দৈর্ঘ্যে। এভাবে পৌঁছে গেলেন মহাবিশ্বের সাইজ পর্যন্ত। আর্কিমিডিসের হিসাব অনুসারে পুরো মহাবিশ্বকে ১০৫১ টি বালুকণা দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করা যাবে। যার ফলে (এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের) বাইরের স্থির তারকার গোলকও বালুতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবে। (১০৫১ কিন্তু আসলেই বড়সড় এক সংখ্যা। ধরুন আপনার কাছে ১০৫১ টি পানির অণু আছে। বর্তমানে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই মিলে প্রতি সেকেন্ডে এক টন করে পানি পান করলে সবটুকু পানি শেষ করতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বছর লাগবে।) এই সংখ্যা এতই বড় ছিল যে গ্রিকদের গণনাবিদ্যা এর কাছে এসে পরাস্ত হয়। বিশাল বড় সংখ্যাদের প্রকাশ করার জন্যে আর্কিমিডিসকে একেবারে নতুন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়।

গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতিতে ১০,০০০ (অযুত) ছিল সবচেয়ে বড় গুচ্ছ। অযুতের সাহায্যে গ্রিকরা অযুত অযুত (১০ কোটি) সংখ্যাকেও প্রকাশ করতে পারত। আরও কিছুটাও যেতে পারত আরও বড় সংখ্যার দিকে। কিন্তু একটি নতুন চিন্তার সূচনা করে আর্কিমিডিস এই বাধা পেরিয়ে যান। তিনি শুরু করেন খুব সরলভাবে। শুরুতে ১০ কোটিকে ধরে নিলেন ১। আবার গণনা শুরু করে সংখ্যাগুলোকে নাম দিলেন দ্বিতীয় ক্রমের সংখ্যা। (আর্কিমিডিস ১০০,০০,০০,০০১কে ১ ধরেননি। ১০০,০০,০০,০০০কেও ০ ধরেননি। আধুনিক গণিতবিদেরা যদিও সেটাই করবেন। আর্কিমিডিস খেয়াল করেননি, ০ থেকে শুরু করাই বেশি যুক্তিযুক্ত হত।) দ্বিতীয় ক্রমের সংখ্যারা অযুত অযুত থেকে চলে এল অযুত অযুত অযুত অযুতে। তৃতীয় ক্রমের সংখ্যারা হলো অযুত অযুত অযুত অযুত অযুত অযুত বা ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০। এভাবে যেতে যেতে তিনি গেলেন ১০ কোটিতম ক্রম পর্যন্ত। এদেরকে তিনি নাম দেন প্রথম যুগের সংখ্যা। কাজটি সুখকর ছিল না। তবে কাজ তাতে হয়ে গেছে। নিজের চিন্তন পরীক্ষা করতে আর্কিমিডিসের যা প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশিই হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগুলো বড় হলেও ছিল সসীম। মহাবিশ্বকে বালু দিয়ে ভর্তি করতে যত বালু লাগবে সে সংখ্যার চেয়ে বেশি। গ্রিক মহাবিশ্বে অসীমের দরকার পড়েনি।

আরও সময় পেলে হয়ত আর্কিমিডিস অসীম ও শূন্যের আকর্ষণ দেখতে শুরু করতেন। কিন্তু স্যান্ড রেকোনার (বালু গণনাকারী) বালু গুনতে গুনতে নিয়তির সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন। রোমকদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা সিরাকিউসবাসীর ছিল না। সিরাকিউসের পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের জনবল ছিল দুর্বল। দেয়ালগুলো বেয়ে সহজেই এপারে চলে আসা যেত। এর ফলে রোমানরা কিছু সৈন্যকে শহরের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। রোমানরা শহরে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পেরে সিরাকিউসবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার মনোবল গেল ভেঙে। রোমানরা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আর্কিমিডিসের সেদিকে মন দেওয়ার সময় ছিল। তিনি মাটিতে বসে বালুতে বৃত্ত আঁকছিলেন। চেষ্টা করছিলেন একটি উপপাদ্য প্রমাণ করতে। এক রোমক সৈন্য ৭৫ বছর বয়সী আলুথালু আর্কিমিডসকে দেখে পেছন পেছন যেতে বলল। আর্কিমিডিস মানলেন না। কারণ প্রমাণ তখনও শেষ হয়নি। সৈন্যটি রেগে গিয়ে তাঁর গর্দান কেতে ফেলল। এভাবেই রোমকদের অপ্রয়োজনীয় হত্যার শিকার হয়ে মারা যান প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবী মানুষটি। গণিতের জগতে রোমানদের সবচেয়ে বড় অবদান হলো আর্কিমডিসের হত্যা। রোমকরা প্রায় সাত শতাব্দী শাসন ক্ষমতায় ছিল। এই পুরো সময়ে গণিতের বড় কোনো অগ্রগতি নেই। সময় তো আর থেমে থাকে নি। ইউরোপে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার হয়েছে। রোমানদের পতন হয়েছে। আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়েছে। শুরু হয়েছে অন্ধকার যুগ। আরও সাত শতাব্দী পরে পাশ্চাত্যে শূন্য ফিরে আসে।

এর মাঝে আবার দুজন সন্ন্যাসী শূন ছাড়াই একটা ক্যালেন্ডার বানালেন। যা আমাদেরকে চিরকালের জন্যে বিভ্রান্তির সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

**অন্ধ অভিসার**

*এ এক তুচ্ছ ও শিশুসুলভ আলাপ। আমাদের বক্তব্যের বিরোধীতাকারীদের নির্বুদ্ধিতারই বহিঃপ্রকাশ এটি।*

- দ্য টাইমস (লন্ডন), ২৬ ডিসেম্বর, ১৭৯৯

এই 'তুচ্ছ ও শিশুসুলভ' আলাপটি হলো নতুন শতাব্দীর সূচনা নিয়ে। নতুন শতাব্দী কি ০০ তে শুরু হবে, নাকি ০১ থেকে। এই আলাপটি এক শ বছর পরপর ঘড়ির কাঁটার মতো ফিরে ফিরে আসে। মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীরা শূন্যের কথা জানলে ক্যালেন্ডার নিয়ে এই ঝামেলায় পড়া লাগত না।

তবে না জানার জন্য সন্ন্য্যাসীদের দোষ দেওয়া যায় না। আসলে মধ্য যুগের পশ্চিমে শুধু খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরাই গণিত নিয়ে পড়াশোনা করেছে। শুধু তাদের মধ্যেই কিছু বিজ্ঞ লোক খুঁজে পাওয়া যেত। দুটি কারণে তাদের গণিতের প্রয়োজন পড়েছিল। প্রার্থনা আর অর্থ। টাকা গুনতে তাদের জানতে হয় কীভাবে...হুম...টাকা গুনতে হয়। এর জন্যে তারা ব্যবহার করত অ্যাবাকাস বা কাউন্টিং বোর্ড। কাউন্টিং বোর্ডও অ্যাবাকাসের মতো ছিল। যেখানে পাথর বা এমন কিছুকে টেবিলের ওপর চালাচালি করা হত। কাজটায় অত সৃজনশীল ছিল না। তবে প্রাচীন সময়ের কথা চিন্তা করলে সেটাই ছিল অত্যাধুনিক। আবার প্রার্থনার জন্য পূজারীদের সময় ও তারিখ জানা লাগত। ফলে পূজারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সময়গণনা ছিল অপরিহার্য। নিয়মিত বিরতিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা করতে হত। (ইংরেজি noon বা দুপুর শব্দটি এসেছে nones থেকে। যার অর্থ হলো মধ্যযুগের দিনের মধ্যভাগের প্রার্থনা) সময় না জানলে রাতের প্রহরী কীভাবেই বা সঙ্গীদের আরামের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে বলবে? একটা ভাল ক্যালেন্ডার না থাকলে কীভাবে জানা যাবে কখন ইস্টার১০ উদযাপন করতে হবে? এটা ছিল এক বড় সমস্যা।

ইস্টারের তারিখ বের করা সহজ কোনো কাজ ছিল না। এক ক্যালেন্ডারে তারিখ আসে একেকটা। গির্জার কেন্দ্র ছিল রোমে। আর খ্রিষ্টানরা ব্যবহার করত রোমান সৌর ক্যালেন্ডার। এতে দিনের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ৩৬৫। কিন্তু যিশু (আ) ছিলেন জাতিতে ইহুদী। তিনি তাই ব্যবহার করতেন ইহুদীদের চান্দ্র পঞ্জিকা। যেটায় দিনের সংখ্যা মাত্র ৩৫৪-এর মতো। যিশুর (আ) জীবনে বড় ঘটনাগুলো চান্দ্র মাসের তারিখ দিয়ে নথিভূক্ত আছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে সূর্যের ভূমিকা বেশি। ক্যালেন্ডার দুটির তারিখে গরমিল সবসময় হতেই থাকে। ফলে ছুটির দিন বের করা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ইস্টারও এমন একটি গরমিলের কবলে পড়া ছুটির দিন। এ কারণে কয়েক প্রজন্ম পর পর একজন সন্ন্যাসীকে দায়িত্ব দেওয়া হত পরের ১০০ বছরের ইস্টারের তারিখ বের করে রাখার জন্য।

দিওনিসিউস এক্সিগুস ছিলেন এমন একজন সন্ন্যাসী। ষষ্ঠ শতকে পোপ ১ম জন তাকে ইস্টারের তারিখগুলো আরও বেশি বের করে রাখার জন্য বলেন। তারিখগুলোকে রূপান্তর ও নতুন হিসাব করতে গিয়ে দিওনিসিউস একটু গবেষণা চালালেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যিশুর (আ) জন্মতারিখও বের করতে পারবেন। কিছু সময় গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করে তিনি ঠিক করলেন বর্তমান বছর হলো যিশুর (আ) জন্মের ৫২৫তম বছর। দিওনিসিউস ভাবলেন, যিশুর জন্ম বছরই ১ম বছর বা ১ম খ্রিষ্টাব্দ হওয়া উচিত। অবশ্য দিওনিসিউস বলেছিলেন, খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছিল আগের বছরের ২৫ ডিসেম্বরে। কিন্তু তিনি ১ জানুয়ারির ১ তারিখে ক্যালেন্ডার শুরু করেন রোমান বর্ষের সাথে মিল রাখার জন্য। তার পরবর্তী বছর ছিল ২য় খ্রিষ্টাব্দ, পরেরটা ৩য় খ্রিষ্টাব্দ ইত্যাদি। এর মাধ্যমে আগের বহুল প্রচলিত দুটি তারিখ নির্ধারণ পদ্ধতির জায়গায় নতুন এ নিয়ম আসল১১। কিন্তু সমস্যা একটা থেকে গেল। আসলে দুটি।

প্রথম কথা হলো, দিওনিসিউস যিশুর (আ) ভুল জন্মতারিখ বের করে। বিভিন্ন সূত্রের ঐকমত্য থেকে জানা যায়,রাজা হেরোড নবজাতক মসীহ (আ) সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন। এ কারণে মেরি ও জোসেফ রাজার আক্রোশ থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু হেরোড মারা যান খ্রিষ্টপূর্ব তিন সালে। মানে খ্রিষ্টের (আ) জন্মের কয়েক বছর আগেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দিওনিসিউসের ভুল হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, খ্রিষ্টের (আ) জন্ম হয়েছিল চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালে। দিওনিসিউসের হিসাবে কয়েক বছরের ভুল হয়েছিল।

সত্যি বলতে এ ভুল কিন্তু অত মারাত্মক কিছু নয়। ক্যালেন্ডারের প্রথম বছর বাছাই করার ক্ষেত্রে কোন বছর বাছাই করা হলো তা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে পরের সব হিসাব হতে হবে নির্ভুল। চার বছরের ভুলে কোনো ক্ষতি নেই, যদি সবাই ভুলটার ব্যাপারে মেনে নেয়। যেমন আমরা মানলাম। কিন্তু দিওনিসিউসের ক্যালেন্ডারে আরও মারাত্মক এক সমস্যা ছিল। আর তা হলো শূন্য।

শূন্যতম বছর ছিল না এতে। এমনিতে এতে কোনো অসুবিধা নেই। সে সময়ের বেশিরভাগ ক্যালেন্ডার প্রথম বছর থেকে শুরু। শূন্য নয়। শূন্যতে শুরু করার কোনো উপায়ই দিওনিসিউসের ছিল না। তিনি শূন্যের কথা জানতেনই না। তিনি বেড়ে ওঠেন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর। রোমানদের স্বর্ণযুগেও গণিতে ভাল কিছু করে দেখাতে পারেনি। ৫২৫ সালে শুরু অন্ধকার যুগের। পশ্চিমারা গোলমেলে রোমান পদ্ধতির সংখ্যা ব্যবহার করা শুরু করল। এই গণনাপদ্ধতিতে কোনো শূন্য ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই দিওনিসিউস যিশুর (আ) জন্মের প্রথম বছর হবে বছর নং ১ (I)। পরের বছর হবে II। আর দিওনিসিউস এ সিদ্ধান্ত নেন DXXVতম বছরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর তাছাড়া দিওনিসিউসের ক্যালেন্ডার তখনো অত জনপ্রিয় হয়নি। ৫২৫ সালে রোমান রাজ দরবারের বুদ্ধিজীবিরা এক মহা সমস্যায় পড়ল। পোপ জন মারা গেলেন। ক্ষমতার পালাবদল হলো। সব দার্শনিক ও দিওনিসিউসের মতো গণিতবিদদেরকে দরবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। তাও ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। অন্তত প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরছেন। (অন্যরা এত ভাগ্যবান ছিলেন না। অ্যানিসিউস বোথিউস ছিলেন প্রভাবশালী দরবারী। মধ্যযুগের অন্যতম পাশ্চাত্য গণিতবিদ।উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব। দিওনিসিউসকে অফিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রায় একই সময়ে বোথিয়াসও ক্ষমতা হারান। বন্দী করা হয় তাকে। বোথিয়াস ইতিহাসে ঠাঁই অবশ্য গণিতের জন্য পাননি। পেয়েছেন তার দ্য *কন্সোলেশন অব ফিলোসফি* (দর্শনের সান্ত্বনা) গ্রন্থের জন্য। এখানে তিনি এরিস্টটলীয় ধরনের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে তাকে পিটিয়ে মারা হয়।) যাই হোক,বছরের পর বছর এই দুর্বলতা নিয়ে চলতে থাকে নতুন পঞ্জিকা।

নতুন পঞ্জিকায় শূন্য নেই। সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে দুই শতাব্দী পরে। ৭৩১ সালের দিকে দিওনিসিউসের ইস্টার টেবিল ফুরিয়ে আসছে। উত্তর ইংল্যান্ডের ক্রমেই শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠা সন্ন্যাসী বিড টেবিলটাকে আবারও বড় করলেন। সম্ভবত এভাবেই তিনি দিনিওসিউসের কথা জানতে পেরেছিলেন। বিড ব্রিটেনের গির্জার ইতিহাস লিখেছিলেন *দ্য ইক্লেসিয়েসটিক্যাল হিস্ট্রি অব দ্য ইংলিশ পিপল* বইয়ে। এখানে তিনি ব্যবহার করেছেন নতুন পঞ্জিকা।

বইটি অসাধারণ সাফল্য পায়। কিন্তু এতে ছিল মস্ত বড় এক ভুল। বিড খ্রিষ্টপূর্ব ৬০ সাল থেকে ইতিহাস শুরু করেন। মানে দিনিওসিউসের মূল বর্ষ থেকে অনেক আগেই। বিড নতুন তারিখ পদ্ধতি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন না। তিনি তিনি দিনিওসিউসের পঞ্জিকাকে পেছন দিকে লম্বা করে নিলেন। বিডও কিন্তু শূন্যের কথা জানতেন না। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের আগের বছরটি তাই ছিল খ্রিষ্টপূর্ব এক। শূন্যতম বছরের অস্তিত্ব ছিল না।

প্রথম দৃষ্টিতে এই ক্রমিক পদ্ধতিকে খারাপ কিছু মনে হবে না। কিন্তু এটা ঝামেলা ঠিকই বাঁধিয়েছে। খ্রিষ্টাব্দগুলোকে ধনাত্মক আর খ্রিষ্টপূর্ব সালগুলোকে ঋণাত্মক সাল মনে করুন। বিডের গণনাপদ্ধতি ছিল: ..., -৩, -২, -১, ১, ২, ৩, ...। শূন্যের জায়গা হওয়া উচিত ছিল -১ ও ১ এর মাঝে। কিন্তু শূন্যকে রাখা হয়নি। সবাইকে যা ঠেলে দিল ভুলের দিকে। ১৯৯৬ সালে ওয়াশিংটন পোস্টে পঞ্জিকা নিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখক সবাইকে সহস্রাব্দ বিতর্ক (মিলেনিয়াম কন্ট্রোভার্সারি) নিয়ে চিন্তা করার উপায় বাতলে দেন। এরপর কোনো কিছুই না ভেবে বলে দিলেন, যেহেতু যিশুর (আ) জন্ম চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালে, ১৯৯৬ হলো তাঁর জন্মের ২০০০তম বছর। দেখে একেই সঠিক মনে হয়। (১৯৯৬-(-৪)) = ২০০০। কিন্তু ভুল। আসলে এটা হবে ১৯৯৯তম বছর।

ধরুন একটি বাচ্চার জন্ম হলো চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালের জানুয়ারির ১ তারিখে। তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে তার বয়স এক বছর। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে বয়স দুই। খ্রিষ্টপূর্ব এক সালে বয়স তিন। প্রথম খ্রিষ্টাব্দে তার বয়স দাঁড়াল চারে। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে তার বয়স হবে পাঁচ। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির ১ তারিখ পর্যন্ত তার জন্মের পর কত বছর সময় অতিবাহিত হলো? অবশ্যই পাঁচ বছর। কিন্তু বছর বিয়োগ করে এটা পাওয়া যাবে না। ২-(-৪) = ৬। ভুল হচ্ছে শূন্যতম বছর না থাকার কারণে।

আসলে শূন্যতম খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাচ্চাটির বয়স চার হওয়ার কথা। প্রথম খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে ছয়। এভাবে হিসাব করে গেলে সব সংখ্যা ঠিকভাবে কাজ করবে। বাচ্চার বয়স বের করতে হলে সরল একটি বিয়োগ করতে হবে। ২ থেকে -৪। কিন্তু তা নয়। ঠিক ফল পেতে হলে যোগফল থেকে আরও বাড়তি এক বিয়োগ করতে হবে। অতএব, ১,৯৯৬ সালে যিশুর (আ) বয়স ২,০০০ বছর ছিল না। ছিল ১,৯৯৯। ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর। তার চেয়েও খারাপ আসলে।

ধরুন একটি বাচ্চার জন্ম হলো প্রথম বছরের প্রথম দিনের প্রথম সেকেন্ডে। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির ১ তারিখে। দ্বিতীয় বছরে তার বয়স হবে এক, তৃতীয় বছরে দুই ইত্যাদি। ৯৯তম বছরে তার বয়স হবে ৯৮। ১০০তম বছরে ৯৯ বছর। এবার ধরুন বাচ্চার নাম দেওয়া হলো শতক। ১০০তম বছরে শতকের বয়স ৯৯। সে তার ১০০তম জন্মদিন পালন করবে ১০১তম বছরের জানুয়ারির ১ তারিখে। তার মানে দ্বিতীয় শতাব্দী শুরু হবে ১০১ সালে। একইভাবে তৃতীয় শতাব্দী শুরু হবে ২০১ সালে। আর বিংশ শতাব্দী ১৯০১ সালে। এর অর্থ হলো একবিংশ শতাব্দী বা তৃতীয় সহস্রাব্দ শুরু হবে ২,০০১ সালে। সহজে হয়ত ব্যাপারটা চোখে পড়ে না।

১,৯৯৯ সালের ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে সব হোটেল-রেস্টুরেন্ট অগ্রিম বুক হয়ে গেল। ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে নয় কিন্তু। সহস্রাব্দ উৎসব সবাই করল ভুল তারিখে। উৎসবকারীদের উৎসাহের কাছে হার মানল রয়েল গ্রিনউইচ মানমন্দিরও। অথচ পৃথিবীর সময় সংরক্ষণ ও তারিখের গোলমাল সমাধানের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব তাদেরই। মানমন্দিরের পারমাণবিক ঘড়ি এগিয়ে চলছে। আর নিচে ওদিকে মানুষ আশায় বসে আছে, সরকারি অর্থায়নে মহোৎসব হবে। হবে স্মরণীয় এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আয়োজকরা তারিখ ঠিক করে রেখেছে ৩১ ডিসেম্বর, ১,৯৯৯। অনুষ্ঠান শেষ ২,০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর, যখন কিনা মাত্র মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদরা সহস্রাব্দ উৎসব শুরু করেছেন।

জ্যোতির্বিদরা অন্যদের মতো করে সময় নিয়ে খেলতে পারেন না। তারা নজর রাখেন মহাকাশে। মহাকাশের ঘড়ি অধিবর্ষে ধাক্কা খায় না। মানুষ পঞ্জিকা বদলাতে চাইলেই বদলে যায় না মহাকাশ। এ কারণে জ্যোতির্বিদরা মানুষের পঞ্জিকাকে এড়িয়ে চললেন। তারা যিশুর (আ) জন্ম থেকে বছর গণনা করেন না। তারা গণনা শুরু করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭১৩ সালের জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে। এ সালটা মোটামুটি ঝামেলাবিহীন সংখ্যা। ১৫৮৩ সালে পণ্ডিত জোসেফ স্ক্যালিগার তারিখটি ঠিক করেন। তার বানানো জুলিয়ান তারিখ মহাকাশের ঘটনার তারিখের হিসাব রাখার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। জুলিয়ান (জুলীয়?) তারিখগুলো জুলিয়ান পঞ্জিকা থেকে আলাদা। এর নামকরণ হয়েছে স্ক্যালিগারের বাবার নাম থেকে। জুলিয়াস সিজার নয়। এ তারিখগুলোতে একের পর এক সংশোধন করতে থাকা পঞ্জিকাগুলোর মতো ঝামেলা ছিল না। পরে অবশ্য এ পদ্ধতিতে একটু পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জিত জুলীয় তারিখ একদম ২৪,০০,০০০ দিন ও ১২ ঘণ্টা কম। এতে শূন্যতম ঘণ্টা পড়েছে ১,৭১,৮৫৮ সালের মধ্যরাতে। এটাও মোটামুটি সাধারণ এক সংখ্যা।

জ্যোতির্বিদরা হয়ত পরিমার্জিত ৫১,৫৪২ জুলীয় তারিখ উদযাপন করতে চাইবেন না। ইহুদিরা এড়িয়ে যাবে ৫৭৬০ সালের ২৩ তেভেত (ইহুদি পঞ্জিকার দশম মাস)। মুসলমানরা ভুলে যাবে ১,৪২০ সালের ২৩ রমাদান। তবে দ্বিতীয়বার ভাবলে হয়ত তারা এমনটা করবে না। সবাই বুঝতে পারবে তারিখটা হলো আসলে ১,৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। আর ২,০০০ সালটার মধ্যে আছে বিশেষ কিছু একটা।

ঠিক কী কারণে তা জানা না গেলেও আমরা মানুষরা সুন্দর সংখ্যা ভালোবাসি। ভালোবাসি এমন সংখ্যা যাতে আছে অনেক অনেক শূন্য। আমরা ৯৯'র পরে ১০০ দেখার জন্য বসে থাকি। ৯৯৯-এর পরে বসে থাকি ১,০০০ এর জন্য। বাচ্চারা ১০০, ১০০০ দেখলে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

**শূন্যতম সংখ্যা**

পোলিশ গণিতবিদ ওয়াক্ল সিয়েপিন্সকি চিন্তিত হয়ে ভাবছেন লাগেজের আরেকটা ব্যাগ কোথায় গেল। স্ত্রী বলল, "প্রিয়, ছয়টি ব্যাগই তো আছে।" "তা কীভাবে হয়? আমি তো কয়েকবার গুনলাম: ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫।

~ দ্য বুক অব নাম্বারস, জন কওনয়ে ও রিচার্ড গাই

দিওনিসিউস ও বিড পঞ্জিকায় শূন্যকে না রেখে ভুল করে ফেলেছিলেন। ব্যাপারটা শুনতে হয়ত অদ্ভুত লাগবে। কারণ বাচ্চার এক, দুই, তিন ... এভাবে গোনে। শূন্য, এক, দুই... এভাবে না। মায়ানরা ছাড়া আর কারও শূন্যত বছর ছিল না। কেউ মাসের শুরু করেনি শূন্য দিন থেকে। একে অস্বাভাবিক লাগে। তবে পেছন দিকে গুনতে গেলে সেটাই আবার স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক। শুরু!

স্পেস শাটল মহাশূন্যে ছুটে যাবার আগে শূন্যের জন্যে অপেক্ষা করে। শূন্যতম ঘণ্টায় ঘটে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম ঘণ্টায় নয়। বোমার বিস্ফোরণস্থলের দিকে যেতে থাকলে আপনি যেতে থাকেন গ্রাউন্ড জিরোর দিকে।

ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, মানুষ আসলে শূন্য থেকে গণনা শুরু করে। স্টপওয়াচ চলতে শুরু করে ০:০০:০০ থেকে। এক সেকেন্ড পরে দেখা যায় ০:০১:০০। নতুন গাড়ির অডোমিটারে (দূরত্ব পরিমাপক) লেখা থাকে ০০০০০।

অনুবাদকের নোট

১। গ্রিক দার্শনিক জেনো তার নিজের ও পারমিনিডিসের কিছু মতবাদ প্রমাণের জন্যে বেশ কিছু প্যারাডক্স তৈরি করেন। মূলত তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, গতি বলতে কিছু নেই। সবই চোখের ভুল। প্যারাডক্সগুলোর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত একটি হলো একিলিজ ও কচ্ছপ প্যারাডক্স। এমন বেশ কিছু প্যারাডক্স নিয়ে জানা যাবে অনুবাদকের *অসীম সমীকরণ* বইয়ে।

২। কথাটি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট বা নববিধানের বুক অব জনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ। তবে মূল সংস্করণে *অনুপাত* শব্দের বদলে *শব্দ* বলা হয়েছে। তবে গ্রিক ভাষায় অনুপাতকে বলা হয় লোগোস। আবার *শব্দ* বোঝাতেও একই শব্দ বোঝানো হয়। যার ফলে প্রথাগত অনুবাদের চেয়ে *অনুপাত* বলাটাই বেশি ভাল অনুবাদ।

-লেখকের নোটের আলোকে অনুবাদক।

৩। পৃথিবীর রাতের আকাশে খালি চোখে শুধু পাঁচটি গ্রহই দেখা সম্ভব। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এ কারণেই প্রাচীনকালে মানুষ গ্রহ বলতে এই পাঁচটিকেই চিনত।

৪। সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা অবশ্যই একেজনের কাছে একেকটি। কারও কাছে পাই (৩.১৪১৬) সবচেয়ে সুন্দর। কারও কাছে (আমিসহ) আবার সুন্দর অয়লার সংখ্যা (২.৭১৮...)।

৫। কারণ অর্ধ-ইঞ্চিকে আদর্শ বানালে মোট দাগ হবে ২৪টি। তাহলে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চিতে পড়বে ১০+১ টি = ১১টি দাগ। বাকি অংশও এভাবে।

৬। মূলদ সংখ্যার ইংরেজি নাম rational number, যাকে আক্ষরিক বাংলা করলে হয় যৌক্তিক সংখ্যা।

৭। ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর সেটকে বলা হয় স্বাভাবিক বা গণনা সংখ্যা।

৮। বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না অনস্তিত্ব কোনোটাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। অনেকে বাস্তবে যেটা করে সেটা হলো বিজ্ঞানকে সুকৌশলে নিজের যুক্তির জন্য কাজে লাগানো। বিজ্ঞান হলো প্রকৃতির একটি মডেল, যা দেখা ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাস দেয়। এই মডেল কখনোই পুরোপুরি সঠিক নয়। আইনস্টাইন না নিউটনের তত্ত্ব শতভাগ সঠিক নয়। বিজ্ঞানে ক্রমেই এক মডেলের বদলে অন্য আরও ভাল মডেল স্থান করে নেয়। এ জন্যেই জর্জ বক্স বলেছেন, “কোনো মডেলই সঠিক নয়, তবে কিছু মডেল কাজে আসে।“ যেমন কাজে নিউটন বা আইনস্টাইনের অনির্ভুল তত্ত্বগুলো।

৯। জেনো যেভাবে যেকোনো সসীম জিনিসকে অসীম বানিয়ে দিতেন। ধরুন বাস ধরতে হলে আপনাকে ১ মাইল হাঁটতে হবে। ১ মাইল যেতে হলে আগে ৫০০ মিটার যেতে হবে। ৫০০ মিটার যেতে হলে ২৫০ মিটার তো আগে যেতে হবে। সেজন্যে আবার ১২৫ মিটার। এভাবে চিন্তা করলে অসীম সংখ্যক দুরত্ব পাড়ি দিতে হবে। যা আসলে একটি কৃত্রিম অসীম। কারণ সবগুলো দূরত্ব যোগ করলে দাঁড়ায় ঐ এক (১) মাইলই।

১০। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যিশুকে (আ) ক্রুশবিদ্ধ করার পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হন। এ ঘটনার নামই ইস্টার।

১১। একটি পদ্ধতিতে ১ম বর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছিল রোম শহরের প্রতিষ্ঠাকে ভিত্তি ধরে। আরেকটিতে সম্রাট ডায়োক্লিশানের সিংহাসনে আরোহণকে ভিত্তি ধরা হয়। খ্রিষ্টানদের কাছে তাদের নবীর জন্ম একটি শহর প্রতিষ্ঠার চেয়ে গুরুতপূর্ণ। যে শহরকে আবার ভ্যান্দাল ও গথরা কয়েকবার লুণ্ঠন করেছে। আবার কোনো সম্রাটের শাসনকালের সূচনা নিয়েও তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। যার আবার ছিল এক দূর্ভাগ্যজনক শখ: খ্রিষ্টানদের ভোজের জন্য সে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণীদেরকে বন্দী করে ধরে রাখত।